নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, সোমবার, ২৪ ভাদ্র, ১৪৩১

ডাক্তারবাবুদের ‘অভয়া ক্লিনিক’ মানুষের আস্থা অর্জন করছে

বিশেষ সংবাদদাতা : তিলোত্তমার বিচার চেয়ে নানাভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে নাগরিক সমাজ। এক মাসের সময়কালে আজ তারা সঙ্ঘবদ্ধ। দেশে বিদেশে নিজ নিজ মতে প্রতিবাদ। ৮ আগস্ট বিশ্ব জুড়ে বাঙালি মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে পথে নেমে রাতের দখল নেয় মানুষ। বাজে অরিজিৎ সিংহের বিখ্যাত অভয়ার জন্য গান ‘আর কবে’। বর্ধমান জেলার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পক্ষ থেকে ‘অভয়া ক্লিনিক’ চালু করা হয়েছে। যা শহর অঞ্চলে আগেই শুরু হয়েছিল। একে আন্দোলনকারী ডাক্তাররা বলছেন অভয়ার খুনিদের শাস্তির দাবিতে এটাও আন্দোলনের অঙ্গ।

৫ সেপ্টেম্বর বর্ধমানের টাউনহলে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের জয়েন্ট জুনিয়র ডক্টরস অফ ফোরাম এবং সিনিয়ার ডাক্তাররা বিনা খরচায় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া শুরু করেছেন। ২৩০ জন রোগীর চিকিৎসা ও ৩৫ জনের ইকো করানো হয়েছে। আপাতত মেডিসিন, গাইনি, পিডিয়াট্রিকস, অরথোপেডিক, ডেন্টাল, ইএনটি এবং চোখের ডাক্তার নিয়েই এই ক্লিনিক। তিলোত্তমার সু-বিচার যত দিন না মিলছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে এই পরিষেবা দেওয়া হবে গাছতলায়, স্টেশনে, বাসস্ট্যান্ডে যেখানে তাদের সম্ভব হবে। মূলত জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি আন্দোলনের ঘাটতি মেটানোর জন্য এই অভয়া ক্লিনিক। সাধারণ মানুষ ভোগান্তি দূর করতেই এই ক্লিনিক। হাসপাতালে এমার্জেন্সি পরিষেবা যেমন ছিল সেরকমই থাকবে। সিনিয়ার ডাক্তাররা তাদের ব্যস্ত সময় থেকে বার করে এই ‘অভয়া ক্লিনিকেও’ থাকবেন। এ ক্লিনিকটি তিলোত্তমার ন্যায় বিচার পর্যন্ত স্থায়ী হবে। ৭ সেপ্টেম্বর জামালপুরের আঝাপুরে ক্লিনিক হয়েছে। এখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আলো পাখা নেই। ডাক্তারবাবুরা টর্চ মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে স্ট্রি তে চিকিৎসা করেন। মূলত দুয়ারে চিকিৎসা

—এরপর চারের পাতায়

নর্থ চ্যানেল জয়ী সায়নীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ সেপ্টেম্বর : সদ্য নর্থ চ্যানেল জয়ী সায়নী দাসকে সিপিআই(এম)-এর পক্ষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আগস্ট মাসের শেষে উত্তর আয়ারল্যান্ড ও স্কটলান্ডের মাঝামাঝি অবস্থিত সব থেকে শীতল চ্যানেল জয় করেন। নর্থ চ্যানেল পার করতে সময় লাগে ১৩ ঘন্টা ২২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড। জয়ের পর তিনি কালনা শহরে ফিরে আসেন গতকাল রাতে। সিপিআই(এম) কালনা শহর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর বাড়িতে যান স্বপন ব্যানার্জি, অরুণাভ চক্রবর্তী, কেশব ঘোষ, আলোক রায় প্রমুখ। সায়নী দাসকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানানোর পর সপ্তসিন্ধুর বাকি দুটি চ্যানেল জয় করার লক্ষ্যে শুভকামনা জানানো হয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষক দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৫ সেপ্টেম্বর : ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিবসকে শিক্ষক দিবস পালন করা হয় গোটা দেশে। মেমারি-২ ব্লকের অন্তর্গত সৌতলা মহিষডাঙ্গা হাই স্কুলে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের স্টাফ রুম থেকে পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে মঞ্চে নিয়ে এসে চন্দনের ফোঁটা ও উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা জানায়। এরপর ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিত কুমার ঘোষ ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

শিক্ষক দিবসে বিদ্যাসাগর ও ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ শহিদ সাংবাদিক, লেখক, ও বেঙ্গলুরু থেকে প্রকাশিত ‘লঙ্কেশ’ পত্রিকার সম্পাদক গৌরী লঙ্কেশের উপর আলোচনা সভা হলো সাটিনন্দী উচ্চ বিদ্যালয়ে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, গলসী বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে বিজ্ঞান মনস্কতা শীর্ষক আলোচনা সভায় আলোচনা করেন রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। আলৌকিক নয়, লৌকিক বিষয়ে হাতে কলমে প্রদর্শন করেন আশীষ চক্রবর্তী। আর জি করে চিকিৎসক খুনের প্রতিবাদে প্রস্তাব পাঠ করেন সাটিনন্দী বিদ্যালয়ের শিক্ষক সঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাটি সঞ্চালনা করেন মহম্মদ জিকরিয়া, উপস্থিত ছিলেন দেলোয়ার হোসেন মোল্লা ও আলোক দত্ত সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা।

৩ সেপ্টেম্বর শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিকে তাঁর প্রয়াতা স্ত্রী অনিমা দে-র স্মরণে এককালীন চল্লিশ হাজার টাকা দান করলেন গোপালচন্দ্র দে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ সেপ্টেম্বর : ৭ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের ষোড়শ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন স্থলের নাম ছিল সমীর ভট্টাচার্য নগর এবং মঞ্চের নাম শান্তি চক্রবর্তী মঞ্চ।

প্রতিনিধি সম্মেলনের শুরুতে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মচারীর কথা ও সুরে দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যমে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে একটি সুন্দর উপস্থাপনা পরিবেশন করেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন বিশ্বনাথ রাহা, সুমন চ্যাটার্জী, কুন্তল ভক্ত ও অরিন্দম মৌলিককে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য ডঃ ষোড়শী মোহন দাঁ। উদ্বোধনী বক্তব্যে অধ্যাপক চক্রবর্তী রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন ঘোষ খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন। আর জি করের ডাক্তারের ধর্ষণ খুন ও প্রমাণ লোপাটের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আরও জোরদার আন্দোলন করার অঙ্গীকার করা হয়। প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, নারী নির্যাতনের বিরোধিতা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা সহ ১১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। মোট ২১ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। ৪০ জনের কমিটি নির্বাচিত হয়। বিশ্বনাথ রাহা সভাপতি ও অঞ্জন ঘোষ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হন, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন সুদীপ্ত ব্যানার্জী। ১৭২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ধিক্কার মিছিল ও রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ সেপ্টেম্বর : আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিলের পর রক্ত দেন ছাত্র-যুবরা। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত সিপিআই(এম) নেতা সুজয় সিংহ রায়ের স্মরণে এই শিবির হয় সূর্যপুর গ্রামে। মিছিলে হাঁটেন সূর্যপুরের সাধারণ মানুষও। রক্তদান শিবিরে ৩৬ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করেন।

ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীর চতুর্থ প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে এদিন কালনা শহরের ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী মূর্তির পাদদেশে মানুষ জমায়েত হন। সেখানে মাল্যদান, কবিতা আবৃত্তি, স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। স্মৃতিচারণা করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা স্বপন ব্যানার্জী, আলোক রায় প্রমুখ।

ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীর চতুর্থ প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও মানববন্ধন কর্মসূচি

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০২৪

প্রকাশিত হচ্ছে—সেপ্টেম্বরের শেষে

লিখেছেন : বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, হান্নান মোল্লা, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, অমল হালদার, আভাস রায়চৌধুরী, অরবিন্দ দাশ, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম কোঙার, শ্যামল চক্রবর্তী, অচিন্ত্য মল্লিক, সৈয়দ হোসেন, বিভাস সাহা, রত্না রশীদ, হরিহর ভট্টাচার্য, দেবেশ ঠাকুর, কৌশিক লাহিড়ী, সেখ সাইদুল হক, গীষ্পতি চক্রবর্তী, সুকৃতি ঘোষাল ও আরও অনেকে।

থাকছে : ভ্রমণ, গল্প, কবিতা ।। মূল্য : ৭০ টাকা

পাওয়া যাবে পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ও শারদের বিভিন্ন স্টলে।

বি.এম.সি.এইচ-এ থ্রেট ও দুর্নীতির র‍্যাকেট উন্মোচিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ সেপ্টেম্বর : অভীক দে। একটা নামেই থরহরি কম্প। সঙ্গে দোসর বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। বিষবৃক্ষের ন্যায় বেড়ে ওঠা থ্রেট কালচার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের দাদা হয়ে ওঠে। থ্রেট কালচার দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দেয় আর গাঁটটি মেডিক্যাল কলেজের মতো জুনিয়র ডাক্তার ও ছাত্র ছাত্রীদের। অভয়ার মৃত্যু অনেক দুর্নীতি ফাঁস করেছে। অভয়ার মৃত্যুর পর জুনিয়র ডাক্তার ছাত্রছাত্রীরা থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনে নেমেছে। গত ৩১ আগস্ট কলেজের অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেন আন্দোলনকারীরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট বিরূপাক্ষ বিশ্বাস এবং অভীক দে-কে সাসপেন্ড করা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ অভীক ও দুই প্রাক্তনীর হাসপাতালে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। তিন জন ছাড়াও অভীক ঘনিষ্ঠ ৯ জন স্নাতকোত্তর পড়ুয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। বলা ভালো অভয়ার মৃত্যুর পর তদন্তে গতি আসায় অনেক দুর্নীতি সামনে আসে। এবার দেখে নেওয়া যাক দুর্নীতির জাল কতদূর।

কার্যত মধুচক্র চালাতো অভীক দে'র র‍্যাকেট এমনই অভিযোগ করেছেন এসোসিয়েশন অফ হেল্‌থ সার্ভিস ডক্টরস-এর যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী। মহিলা পড়ুয়াদের সাথে কিভাবে মোবাইলে চ্যাট'এ অশালীন ভাবে গেস্টরুমে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের সাথে অশ্লীল ব্যাবহার করা হতো। সমস্ত

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

ফোঁস

আর জি কর কাণ্ডে যুক্ত অপরাধীদের চিহ্নিতকরণ ও শাস্তির দাবিতে আন্দোলন উত্তাল হচ্ছে—ছড়াচ্ছে শহর থেকে গ্রামে, মহিলাদের প্রতিবাদ থেকে হয়ে উঠছে নাগরিক-প্রতিবাদ, অতিক্রম করেছে শিক্ষিত, পেশাগত, সম্পন্ন ইত্যাদি বিভিন্ন সীমারেখা। কার্যত দিশাহারা মুখ্যমন্ত্রী 'ফোঁস' করার যে দাওয়াই দিয়ে রেখেছেন তার সূত্র ধরে উত্তরে উদয়ন গুহ থেকে দক্ষিণে সাওগি মৈত্র, অর্থাৎ রাজ্য জুড়ে চলছে হুমকি ও চোখ রাঙানি—নানা কায়দায়, নানা মাত্রায়। কেউ প্রতিবাদীদের হাত গুঁড়িয়ে, চোখ খুবলে দেবার কথা বলছে; কেউ 'বদলা' থেকে 'বদলা'য় আসার কথা বলছে; কেউ তাদের 'কুত্তা' বলছে তো কেউ বলছে 'মত্ত হয়ে তাণ্ডব' চালানো গুণ্ডার দল; কেউ আবার শালীনতার সব সীমা অতিক্রম করে বলছে যে যারা আন্দোলন করবে, মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করবে, মা-মেয়ের ছবি বিকৃত করে তাদের দরজায় টাঙিয়ে দেওয়া হবে। তৃণমূল রাজত্বে হুমকি নতুন নয়—ভোট এলেই 'চড়াম-চড়াম', 'নকুলদানা', 'খেলা হবে' শুনতে অভ্যস্ত রাজ্যবাসী। কিন্তু এখন তো নির্বাচন নেই তাহলে কেন এই উৎকণ্ঠিত প্রতিক্রিয়া—খুদে নেতা থেকে সংবিধানের নামে শপথ নেওয়া ক্যাবিনেট মন্ত্রীর?

আসলে মানুষের সব ভয় ভেঙে গেছে—দলের রঙ, ব্যক্তিগত লাভালাভ, নেতার নজরদারি এসব গৌণ হয়ে গেছে। ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে মানুষ, কারণ মানুষ বুঝেছে— বর্তমানে কোনো মহিলাই নিরাপদ নয়। তারা আরো বুঝেছে যে, কোনো নারীনিগ্রহের ঘটনা ঘটলে এ রাজ্যে প্রশাসন ঘটনা চাপতেই তৎপর হয়, আর অপরাধী শাসকঘনিষ্ঠ হলে তাকে আড়াল করাই হয়ে ওঠে সর্বোচ্চ প্রশাসনের অগ্রাধিকার। মানুষ মরিয়া দেখে, চোখ রাঙালে হিতে বিপরীত হচ্ছে দেখে, সুর কিছুটা নরম করতে বাধ্য হচ্ছে প্রশাসন। জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবি মেনে রাস্তার ব্যারিকেড তুলতে বাধ্য হয়েছে লালবাজার, 'পুরস্কৃত' প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন্ড ও তারপর শো-কজ করতে বাধ্য হয়েছে স্বাস্থ্যভবন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে থ্রেট কালচার ও দুর্নীতির তিন পাণ্ডা অভীক, বিরূপাক্ষ ও মুস্তাফিজুর-এর বিরুদ্ধে। এই যে বিলম্বিত পদক্ষেপ, এটাই বড় প্রমাণ যে আন্দোলনের যৌক্তিকতা ছিল, আছে। লাগাতার এবং বহুস্তরীয় প্রতিবাদ না হলে এসব সামান্য ব্যবস্থাও স্বপ্নের অতীত ছিল—অনেক অভিযোগ তো আজকের নয়, বহু পুরনো।

আন্দোলনকে কমজোরি করার একাধিক কৌশল নিচ্ছে প্রশাসন ও শাসকদল। 'অপরাজিতা' নামের 'কড়া' আইন আনা হয়েছে এমন ভাব করে যেন আইনের অভাবেই অপরাধের বাড়বাড়ন্ত। সমস্যাটা আইনের নয়, আইন প্রয়োগের সদিচ্ছায়। দ্বিতীয় কৌশল হলো, প্রতিবাদ আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ—আন্দোলন নাকি 'রাজনৈতিক'। রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে অপরাধ সংগঠিত হবে আর তার প্রতিবাদকে হতে হবে অরাজনৈতিক—বড় হাস্যকর যুক্তি। 'অরাজনৈতিক' বলে কিছু হয় না কি? দলনিরপেক্ষ সুশীল সমাজ করলেও ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করাটাই বিশুদ্ধ রাজনীতি। আর কেন করছে বুঝে না-বুঝে বা কারা রাজনীতি হচ্ছে বলে ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টাও রাজনীতিই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাই সবকিছুকেই দেখেন লেফট, রাইট, সেন্টার বিন্দুর কাছে বা দূরে এইভাবে। যে মিছিলে যার ইচ্ছা যাবে কারণ ইস্যুটাই মুখ্য। সেটা যে ন্যায্য লোক দেখানো হলেও শাসকদলের রাস্তায় নামা, সেটাই প্রমাণ করে। আসলে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সবজান্তা প্রতিনিধিরা বেশ বে-কায়দায় পড়েছে। তাই 'ফোঁস'-এর মধ্যে রামকৃষ্ণ আর প্রতিবাদের মধ্যে রাজনীতি খুঁজছে—এরই মধ্যে 'রাত দখল'-এর জন্য তৈরি হচ্ছে রাজ্যবাসী, সুবিচার ছাড়া কোনো কৌশলেই যাদের দমানো যাবে না।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ সেপ্টেম্বর : এবিটিএ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাইস্কুলে। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অভিনেতা দেবদূত ঘোষ। বক্তব্য রাখেন সাইদুল হক, প্রাক্তন শিক্ষিকা কৃষ্ণা মুখার্জী, জেলা সম্পাদক শিবশঙ্কর সাহা প্রমুখ। আবৃত্তি, প্রবন্ধ, কবিতা, বসে আঁকো, সাঁওতালি, হিন্দি ও উর্দু ভাষার সংগীত, কবিতা আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় ২৫৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি মহকুমা থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীরা অংশগ্রহণ করে। এখান থেকে যারা প্রথম হয়েছে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

কালনায় বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস ও বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে সেনেরডাঙ্গা বাজারে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। বক্তব্য রাখেন, দিলীপ গোস্বামী, কাজী নুরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তপন চ্যাটার্জী।

গলসী ২নং ব্লকে রাত দখল বিভিন্ন স্থানে

গলসী, ৭ সেপ্টেম্বর : গলসীর অন্তর্ভুক্ত বেলান,জাঁহাপুর বাজার ও কুরকুবা গ্রামে তিলোত্তমার খুনি-ধর্ষকদের শাস্তির দাবিতে ৪ সেপ্টেম্বর, মোমবাতি জ্বালিয়ে রাত দখলে পুরুষদের সঙ্গে এগিয়ে এলেন গ্রামের মা-বোনেরাও। বাসুদেব মাঝি, জীবন মাঝি, ভজন মাঝি প্রমুখের নেতৃত্বে বেলানে। জাঁহাপুরে সুকুমার দাস, দেবব্রত দাস প্রমুখ। কুরকুবা গ্রামে ছিলেন জাহান আলী মোল্লা ও মা-বোনেরা।

সহজপুরের সহজিয়া শক্তিপদ ঘোষ : বিস্মৃতপ্রায় একটি শক্তিশালী নাম

দেবেশ ঠাকুর

চলে গেলেন শক্তিপদ ঘোষ। বেঁচে ছিলেন এই খবরটা পরিবারের, খুব কাছের কিছু লোকজন, রাজনৈতিক সহমর্মী ব্যতীত অনেকেই জানতেন না। সকলের জানার কথা তাও নয়। তবু মানুষটি ভীষণভাবে ছিলেন। অপরিহার্য ভাবে ছিলেন। ঝলমলে মঞ্চে নয়। সহজপুর-মুক্তিপুর অঞ্চলের জাম গাছের ছায়ায়, আলপথে বসে, হাল বলদের হাল হকিকতের মধ্যে, কৃষির মধ্যে, কৃষ্টির মধ্যে, কৃষ্টির মধ্যে তিনি ছিলেন।

খবরটা যখন পেলাম তখন খেতে বসেছি। খেতে ইচ্ছে করছিল না। মনে পড়ে গেল, নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কিংবা কর্মশালায় অথবা সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে ভোজনে বসেছি। কেউ বলছে, আলু পোস্তটা আরেকবার রিপিট করা হোক। কারো বক্তব্য, মুরগির মাংসটা বড্ড ঝাল হয়ে গেছে। ভালো করে খেতে দেবে না বলেই কি ঝাল করেছো! শক্তিদাও আমাদের সঙ্গে পংক্তিভোজনে। ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি টিনের কৌটো বার করে মুড়ি খেতে শুরু করলেন। মুড়িটুকুও সংগঠনের কাছ থেকে নেবেন না। এই নিয়ে কত মজা করেছি।

—শুকনো মুড়ি খেয়ে যদি বিপ্লব হতো তাহলে আপনাকে ভিয়েতনামে পাঠিয়ে দেওয়া যেত। যা খান, কলেবরের যা ব্যাপ্তি, তাতে ফু দিলেই তো উড়ে যাবেন। একটু ভালো-মন্দ খেয়ে গতি লাগান। জমির যেমন বতর, সৈনিকের তেমনি গতর।

আকাশি রঙের বা হালকা নীল রঙের পাঞ্জাবি। আর খেটো ধুতি। নীল আর সাদা। এর বাইরে অন্য কোন বেশে মানুষটিকে দেখিনি। মানুষ পোশাক পরে অভ্যাসবশত। ব্যাস ওইটুকু। সর্ষের তেল মাথায় মেখে স্নান সেরে মুড়ির কৌটো খুলে ফেলতেন মুরারি-মোহন। প্রয়োজনের অধিক এতটুকু তাঁর কাছে বিলাসিতা।

সৃজনশীল জেলার সবাই তখন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সাক্ষরতার কর্মশালা করছি। গণনাট্যের রাজ্য সম্পাদক শিশির সেন বলতেন, ক্যাটারারকে বলে রাখতে হবে একটা মিল কম ধরতে হবে। সেটি শক্তিবাবুর। সংগঠনের দশ টাকা খরচও বাড়াবেন না।

আমার মনে আছে, ওই কর্মশালায় নাটক লিখেছিলাম, ধাক্কা। হাজার হাজার শো হয়েছিল রাজ্যজুড়ে। অনেকগুলো ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। নাটকটি প্রথম পড়ে শুনিয়েছিলাম শক্তিদাকে। শুনে একটা কথাও বলেননি। শুধু দেখেছিলাম, চোখের কোল থেকে জল নেমে আসছে। ধুতির খুঁট দিয়ে জল মুছছেন।

সবিনয়ে বলতেন, আমি তো যোদ্ধা নই। সামান্য একজন পদাতিক যোদ্ধা। একটা জিনিস বুঝি, মানুষের মন ছুঁয়েছে কিনা। আসলে মনের কাছাকাছি না গেলে ঠিকঠাক সাহিত্য কবিতা গান নাটক হয় কিনা জানিনা।

নাটক গান কবিতা লেখার ক্ষেত্রে শক্তিদা ১০০ শতাংশ পার্টির অনুগত। একটা গানের কথা আমার মনে আছে। সকালে গণশক্তির সম্পাদকীয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। তারই 'গীতিরূপ' নির্মাণ করে ছেড়ে দিতেন। সুরে ঝামেলা নেই। সব স্বসুরারোপিত। মজা করে বলতাম, শ্বশুরারোপিত। একটা উদাহরণ দিই। কাগজটি দীর্ঘদিন কাছেই ছিল। গণশক্তির সম্পাদকীয় নিম্নরূপ :

ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ভয়ংকর চেহারা নিয়ে দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ধর্মের আফিম দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভেদের রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

শক্তিদার গীতিরূপ :

ভয়ংকর চেহারা নিয়ে এলো ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ
ধর্মের আফিম দিয়ে মানুষকে করে বরবাদ
ভেদাভেদের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিওনা
ভেদাভেদের কথা বন্ধু কানে নিও না
তাইতো বলি কমরেড,
গড়ে তোল ব্যারিকেড।

কমরেড আর ব্যারিকেড এই দুই অন্ত্যমিলের কবিতা এবং গান(?) শক্তিদার রচনায় বারবার এসেছে। এতে ঝুঁকি কম। রোষানলে পড়ার সম্ভাবনা নেই। আমার একটা গান নিয়ে বেশ বিতর্ক হয়েছিল। গানটি এইরকম :

পাইতাম যদি জমি একখান
পাইতাম ম্যাঘের পানি
দিতে পারতাম বেহেশত্ খানি
চরণে তোর আনি....

বিশুদ্ধবাদীরা রে রে করে উঠলেন। গান থেকে বেহেস্ত কথাটি বাদ দিতে হবে। একাধারে আধ্যাত্মিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা আছে। আমিও জেদ ধরে রইলাম। এক লাইনও বদলাবো না। আমার দুই প্রিয় মানুষ, কমল গায়েন এবং শ্রীধর মালিক আমার সপক্ষে বললেন, গ্রামের গরিব দুখি মানুষদের মুখের কথায় এরকম শব্দ আসে যখন তখন। যেমন সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মাসি। সীতা কিবা রাম এখানে গৌণ।

আজ কমলদা শ্রীধরদার কথা প্রসঙ্গ এলেই উঠে আসে। নানা কথায় এঁদের কথা উচ্চারণ করে মনকে স্বস্তি দিই। শক্তিদাও বলেছিলেন, গানটা যেমন আছে তেমনই থাক।

তেমনিই ছিল। সমীর বাউল নামে একজনকে দিয়ে এইচ এম ভি-তে রেকর্ডিং করা হয়েছিল গণনাট্যের শ্রমসংগীত হিসাবে। সম্মেলনে কঙ্কন ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, এই গানটি পিট সিগার সংকলিত আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের গান শীর্ষক সংকলনে স্থান পেয়েছে।

প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছি। শক্তিদা একজন আপাদমস্তক নীতিনিষ্ঠ বাম যোদ্ধা। পার্টির মতামতের বাইরে ব্যক্তিগত কোন আবেগ উচ্ছ্বাস সংস্কৃতি চর্চা তাঁর অভিধানে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গানের সেই পঙক্তি মনে পড়ে যায় : 'সবার চরণধুলায় ধুলায় ধূসর হব।' যাত্রীদলের পিছনে থাকার মানুষ।

কবিতা এবং সংগীত রচনার ক্ষেত্রে পার্টি লাইনের বাইরে ১ সেন্টিমিটারও হাঁটতে চাননি। নিজেকে প্রকট করে তুলতেও কোনদিন চাননি। যেটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মানুষের থাকে। কোনদিন একক ছিলেন না। ছিলেন সমষ্টিতে।

নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। সারা জীবন ছিলেন মাটির কাছাকাছি। ধান এবং প্রাণ তাঁর গান-কবিতার অভিধানে শক্তপোক্ত আসন দখল করেছিল। দক্ষিণ দামোদর এলাকার সাংস্কৃতিক 'নেতা' ছিলেন। কিছু কিছু সাংস্কৃতিক নেতাদের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, নিজের শিল্পকর্মের ব্যাপারে অনমনীয়তা। অর্থাৎ আমার সৃষ্টি এবং সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা অন্যদেরও গ্রহণযোগ্য হোক। আমার লেখা ও সুরারোপিত গানটি অন্যেরা গা'ক। নাটকটি নাট্য দলগুলি অভিনয় করুক। এ প্রত্যাশা শিল্পীর কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু শক্তিদার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। শিল্পী হিসেবে বা সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের নাটক বিষয়ক কর্মশালাগুলিতে এক কোণে বসে থাকতেন শক্তিপদ ঘোষ। অথচ তিনি নির্জনতার মানুষ নন। জনতার মানুষ। বিশেষজ্ঞরা যখন মতামত জানাতেন শক্তিদা সব ডাইরির পাতায় লিখে রাখতেন। সেগুলোর থেকে গ্রহণ করাকে তিনি অনেক গুরুত্ব দিতেন। এ যেন তোমার চরণধুলায় ধুলায় ধূসর হব। যেখানে যেমন পেয়েছেন, খোলামকুচি, মাটির ঢেলা, ধুলোবালি সব সংগ্রহ করে রেখেছেন।

চারের দশকে গণনাট্য আন্দোলনের সূচনার পর্বে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পি সি যোশী মহলাকক্ষে চুপচাপ বসে থাকতেন। নবান্ন-র রিহার্সাল চলছে। কে নেই সেখানে। শম্ভু মিত্র তৃপ্তি মিত্র বিজন ভট্টাচার্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য চারুপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ। সকলেই একেক জন নক্ষত্র। পিসি যোশী কিন্তু কাউকে কোনদিন শিল্প সংক্রান্ত উপদেশ বা সংশোধনী প্রদান করেননি। বরং কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, সংস্কৃতিটা তোমার ব্যাপার। তুমি অনেক ভালো বোঝো।

আমাদের মত সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 'সবজান্তা' মানুষের বড্ড ঠেলাঠেলি। আমরা ব্রেশট স্তানিস্লাভস্কি ইবসেন শ বেকেট গুলে খাওয়া (আসলে পল্লবগ্রাহিতা) মন নিয়ে একটা অরা তৈরি করে রাখি। আয়নাতে মুখ দেখলে সেই দেদীপ্যমান উজ্জ্বল্যে নিজেরাই অভিভূত হয়ে থাকি। অন্যের সৃষ্টির প্রতি কোনদিন নজর দিতে চাইনা। শক্তিপদ ঘোষ সাংস্কৃতিক নেতা ছিলেন। কিন্তু 'কর্মী' বলতে ভালবাসতেন। এটাই তাঁকে এক আলাদা যোদ্ধা বানিয়ে তুলেছিল।

ক-জন তেমনটি পারে?

ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর সম্মেলন ও প্রকাশ্য সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৮ সেপ্টেম্বর : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, মেমারি-১ পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির ১৬তম সম্মেলন রসুলপুরের বাজারে অনুষ্ঠিত হল।

৮ সেপ্টেম্বর রসুলপুরের উলোরা ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, মেমারি-১ পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটি ১৬ তম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন যুব জেলা সম্পাদক অয়নাংশু সরকার। রিপোর্ট এর উপর আলোচনা করেন ৭জন প্রতিনিধি। ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য অন্তরা দত্ত, বাপন ক্ষেত্রপাল, সুমন হাজরা। সম্মেলন থেকে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তন্ময় মণ্ডল। সম্পাদক আব্দুল রউফ। তিন জন যুবতী সহ মোট ১৬ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলন উপলক্ষে মেমারীর রসুলপুর বাজারে বিকাল প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন, আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক আব্দুল রউফ, জেলা সভাপতি অমিত মণ্ডল ও ছাত্র নেতা অনির্বাণ রায় চৌধুরী। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন তন্ময় মণ্ডল।

২০-২১ সেপ্টেম্বর গুসকরায় ডিওয়াইএফআই-এর ২৪তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন উপলক্ষে ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন।

শিক্ষার সেকাল-একাল ও অশোকদা-দের উদ্বেগ

সন্তোষ কুমার পাল

এবছরই ১৪৩১ সাল (২০২৪ খ্রিস্টাব্দ)। সেদিন আষাঢ়ের প্রথম দিবস। আমার গ্রাম (বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত) কেওটসা থেকে পাশের গ্রাম কোঁয়ারপুর। এই গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলেই আমার স্কুল-শিক্ষা। স্বাধীনতার আগের বছরে তৈরি এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়েই শিক্ষা-জীবনের সবচেয়ে গঠনমূলক দিনগুলো কেটেছে। তাই বাড়ি গেলে প্রায়শই কোঁয়ারপুরে যাই সহপাঠী বন্ধুদের খোঁজ-খবর নিতে, ভাবনা-চিন্তা শেয়ার করতে। বেশিভাগ সময় যখন গ্রামে যাই সেই দিনগুলো থাকে হয় ছুটির দিন, নয়তো রবিবার। এবার গেলাম বৃহস্পতিবারে। শুক্রবার সকালে কোঁয়ারপুর উচ্চ বিদ্যালয় (এখন উচ্চ-মাধ্যমিক)-এর ম্যানেজিং কমিটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট আমার সতীর্থ সহপাঠী দিব্যেন্দু রায়। ওকে ফোন করলাম, তোর-আমার তথা আমাদের স্কুলে আমি একবার যেতে চাই। দিব্যেন্দু সাপ্তহে দ্বি-চক্র যানে আমার গ্রামে এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল। অজয় নদের বাঁধ বরাবর যেতে হয়। স্কুলে পৌঁছে দেখি আমার পরিচিত শিবুদা, আমার আর এক সহপাঠী অরুণের সহধর্মিনী শ্রীমতী রিক্তা রায় পার্শ্বশিক্ষক হিসেবে পড়ানোর কাজে যুক্ত রয়েছে। শিবুদা গত বছর অবসর নিলেও শিক্ষকাল্পতায় ভোগা স্কুলের স্বার্থে, ছাত্রছাত্রীদের টানে এখনো ক্লাস নিচ্ছেন। গিয়ে দেখি স্কুলের চেহারা বদলে গেছে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে-উচ্চতায়। ১৯৭৫ সালের চেহারা স্বাভাবিক নিয়মে আজ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বদলে যাবে—এ আর নতুন কথা কী! শুধু মানুষ গড়ার কারিগরের সংখ্যাটাই 'টানা' কাপড়ের মতো হয়ে এসেছে—এদিকে টানলে ওদিকে টান পড়ে! সারা পশ্চিমবঙ্গে অভূতপূর্ব ক্রাইসিস শিক্ষক-শিক্ষিকার। আগে কখনও এরকমটা দেখা যায়নি।

আমাদের সময় সবটাই ছিল গ্রাউণ্ডফ্লোরে। কয়েকটি পাকা ঘর, বাকিগুলি কাঁচা, মাটির তৈরি, করোগেট বা টিনের ছাউনি। এখন পশ্চিম দিকের অনেকটাই দু'তলা। বিজ্ঞানের ল্যাব হয়েছে, উচ্চ-মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগের জন্য যা খুব জরুরি। ক্লাসরুম বেড়েছে, দরজা-জানালা শক্তপোক্ত হয়েছে। শুধু যাদের জন্য এই 'অভাবনীয় উন্নয়ন' তাদের শক্তপোক্ত করে গড়ে তোলার শিক্ষকের-ই অভাব। অন্যান্য অনেকের মতো আমারও আবার বহিরঙ্গে রং-চড়ানো সংস্কৃতিতে আস্থা কমে গেছে। আজকাল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'আমাদের স্কুল' কলামে কত সুন্দর সুন্দর কথাশিল্প পড়ি, যেন কোথাও কোন সমস্যা নেই। আ-আ-আনন্দ বহিছে (শিক্ষা-) ভূবনে...। কিন্তু যখনই আমার ক্লাসে বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষালাগে আসি, কিছু বলতে, বা লিখতে বসি তখন কেমন যেন মনে হয় কাগজের পাতায় ওগুলি সব বানানো পোস্ট-ট্রুথের গল্পকথা!

যাই হোক, ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলাপ করার ব্যবস্থা করে দিলেন স্কুল কতৃপক্ষ। সব ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে ভালো লাগলো। বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একতরফা আমিই কিছু বললাম। ওরা শুনলো। যেরকম প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলাম ততটা হয়তো নয়, তবে আমার ওই কাদা-মাটির দেশ থেকে উঠে আসার গল্প ওরা জানতে চেয়েছিল।

প্রসঙ্গত, আমাদের সময়কালের সেই ক্লাস নাইনের ঘর (তাকে দৈর্ঘ্যে বাড়িয়ে অডিটোরিয়ামের চেহারা দেওয়া হয়েছে)-এ ঢুকে অনেক পুরানো কথা মনে পড়ে গেল। এখন আর ছাত্রছাত্রীরা 'ফেইল' করে কিনা জানি না। তবে আমাদের সময় এই রুমটি তিন/চারটি ব্যাচের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হতো! ষষ্ঠীচরণ, উত্তমেরা এই কক্ষের মায়া ত্যাগ করতে পারত না। দশম শ্রেণির মা সরস্বতী ওদের দিকে মুখ তুলে তাকাতো না। ফলত সে সময় নবম শ্রেণি স্কীতোদর থেকেই যেতো। আর ক্লাস টেনের চেহারা থাকতো স্লিমই। অনুমান করি, এখন কিছুটা সমতা নিশ্চয় এসেছে এই দুই কক্ষের মধ্যে।

অনেক স্যারের কথা মনে পড়ে গেল। ডেডিকেটেড আদর্শ শিক্ষক হিসেবে অনেক স্যারকেই পেয়েছিলাম। বিশেষ কয়েকজনের নাম নেওয়া সমীচীন নয় জেনেও (এবং আগে থেকে মার্জনা চেয়ে রেখে) কয়েক জনের কথা বলছি (এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই)। বিনয়বাবু, যার জীবনটাই শিক্ষালয়ের ঘড়ির মতো। আমাদের একজন বিখ্যাত দার্শনিক কান্ট সম্পর্কে এরকম বলা হয় যে উনি মর্নিংওয়াকে বেরুতে দেখে প্রতিবেশীরা ঘড়ি মিলিয়ে নিতেন! আর আমাদের ক্ষুদিরামদাও আঙরার পাড়ের রাস্তায় স্যার আসছেন দেখে বিদ্যালয়-গুরুর ঘন্টা-টা বাজিয়ে দিতেন! কোনো দিন শিক্ষাদানের পবিত্র কর্মে কোনোরূপ অবহেলা করতে দেখিনি। আর স্যারের ছুটি নেওয়া— সেটা বেশি বলতে পারতেন বোধ হয় ওনার ছেলে-মেয়েদের মামার বাড়ির লোকজনেরা! আর ক্ষুদ্র 'আমি'-র গণ্ডি থেকে আমার 'বড় আমি'র দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে যিনি সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেন সনৎবাবু। অনাথবাবুর ইতিহাস গড়ানো আজো মনে আছে। এখন বুঝি, অতীতকে আরও প্রাণবন্ত করে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে পারলে সমাজ-বিজ্ঞান কত সহজ হয়ে যেতে পারে! স্যারের হাতের লেখা আজও আমার স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। আর আমাদের জীবনের প্রথম পরীক্ষার ফর্মে অ্যাডমিট-অংশে যিনি আমাদের সকলের নাম সযত্নে লিখে দিতেন সেই দীর্ঘাঙ্গী বিকৃত-ছাতির জ্ঞানী মানুষটি ছিলেন তৎকালীন হেডমাস্টার বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে, সব ছাত্রছাত্রীর অবিভাবক হিসেবে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। মৃত্যুঞ্জয়বাবু পড়াতেন জীবন-বিজ্ঞান। আমি অক্সিজেন তৈরির টেস্ট টিউবও ঠিক মতো আঁকতে পারতাম না। আবার মুখস্থ-বিদ্যায়ও বেশ দুর্বল ছিলাম। তাই স্যার আমার উপর হতাশ হয়ে পড়তেন কখনো কখনো। আর শান্ত ভদ্র স্বভাবের সুভাষবাবুর বাংলা পড়ানো আজও মনে পড়ে। (প্রসঙ্গত, স্যারের বাড়ি কৈচরে, কোঁয়ারপুর থেকে মেরে-কেটে ২০ কিলোমিটার। স্যার কিন্তু স্কুলের ছাত্রাবাসেই থাকতেন, সপ্তাহান্তে বাড়ি যেতেন। কথাটা তুললাম এই কারণে যে আমার পাশের গ্রাম চাকুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ম্যাডাম হুগলির শ্রীরামপুর থেকে ডেইলি প্রায় ১৬০ কিলোমিটার যাতায়াত করতেন এই সেদিনও! শিক্ষণ-পেশা সম্বন্ধে ধারণা, কর্তব্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কী অ-সেতুযোগ্য পার্থক্য! —এটুকুই বলার।) আর সীতারামবাবুর শেষ ক্লাসে ট্রানজেসন! প্রান্তিক কৃষক পরিবার তথা তপশিলি জাতের কত ছাত্রছাত্রীদের কত রকমভাবে এনারা সাহায্য করতেন তা ভোলবার নয়। বিনয়বাবু ও মহাদেববাবুর ম্যাপ সহযোগে ভূগোল পড়ানো মনে দাগ কেটে যেতো। ম্যাপ-এটলাসের প্রতি টান আমাকে কয়েক মাস আগেও সোনা-মসজিদ স্থলপোর্ট-এ বাংলাদেশের একটি ম্যাপ কিনতে প্রণোদিত করেছে। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে গিয়ে একটি ম্যাপ কিনতে ভুলে যাওয়া এখনও কষ্ট দেয়। শেষ ক্লাসে মানিকবাবুর তত্ত্বাবধানে খেলাধূলা ও শরীর-চর্চা, রবিবাবুর নির্দেশনায় কর্মশিক্ষায় মোমবাতি তৈরি করা—এসব কিছু প্রাণ-অফুরান করে রাখতো বিদ্যাঙ্গনটিকে। প্রসঙ্গক্রমে জানাই, বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী এই সব মহান শিক্ষকদের কাছে তালিম নিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার- শিক্ষক- অধ্যাপক সহ নানা পেশায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

আজকে আমরা ডিগ্রির বড়াই করি। কিন্তু সেকালের আই.এ পাশ গোরাচাঁদবাবুর কথা শুনুন। এম.এ বিএড শিক্ষক জয়েন করার আগেই ইংরেজি গ্রামার ও কম্পোজিশনের বেসিকটুকু তিনিই আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। একই রকমভাবে ডিগ্রিতে-অনেক -কম সরোজবাবুর বাংলা ব্যাকরণ ও বানান-শব্দার্থ বিষয়ে পাঠ শুধু আমাকে নয়, পরোক্ষভাবে আমার ছেলে ও ছাত্রছাত্রীদেরকেও বাংলা লেখাতে সচেতন হতে শিখিয়েছে। আর একটা কথা তখন মনে হতো—সব মাস্টারই উন্নত আদর্শ মানুষ, সত্যিকারের চক্ষুরুন্মীলক। আজকের ছাত্রছাত্রীরা স্যারেদেরকে কি এভাবে দেখে? স্কুলের পাশ দিয়ে গেলে মন্দিরের ধূপের গন্ধ পায় তারা? জানি না। আজকাল অনেক কিছু যেন কৃত্রিম মনে হয়। তা না হলে ছাত্রদের একটু বকাঝকা করলে ছাত্র বা ছাত্রীটি অভিভাবকদের ডেকে এনে হুজ্জতি করতে পারতো বিদ্যালয়ে! না, আমি ফিজিক্যাল পানিশমেন্ট সমর্থন করি না। কিন্তু ওই বয়সের ছেলে মেয়েদের শুধু বাবা-বাছা করে কাজ হয় কিনা তাও জানি না। তবে আমার কেমন যেন মনে হয়, সরোজবাবু বা সীতারামবাবুর বেতের ঘা যদি হাতের তালুতে না পড়তো তাহলে 'শ্লাঘান্বিত' বা 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব'-এর বানান, বা 'আমি স্কুলের লনে দাঁড়িয়ে গোলমাল করছিলাম'-এর ইংরেজি ট্রান্সলেশন ক্লাস সেভেনেই শিখে উঠতে পারতাম না! আমার স্নাতকোত্তরের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও কিন্তু এখনো ভালো কথায় চিড়ে ভেজে না!

না, আর নিজের কথা বলে অতীতচারিতায় সময় নষ্ট করবো না। আমরা বর্তমানেই বাঁচি। তবু প্রশ্ন, পুরানো কথা বা ইতিহাসের চর্চা আমরা কেন করি? সেদিন হিটলার-মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ নিয়ে বিরাট এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলাম। কেউ বলতে পারেন, কী দরকার ছিল! ফ্যাসিবাদ বা ন্যাৎসিবাদ ইতিহাসের বিভ্রম, যার জন্য দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। দুর্যোগের মেঘ কেটে গেছে। তাই এসব নিয়ে এখন কালক্ষেপণের কী আছে! কিন্তু ঐতিহাসিকরা আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন—গণতন্ত্রের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে যদি ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ কায়েম হতে পারে তাহলে যেকোনো ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বা শাসন থেকে ফ্যাসিবাদ তেড়েফুঁড়ে উঠতে পারে। তাই অতীতকে স্মরণে রাখা। হাজারো মুখোশের আড়ালে ঘোরে এই ফ্যাসিবাদ, যুগে যুগান্তরে। আজকের বাংলা, আজকের ভারতের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালেই আপনার তা মালুম হবে। প্রজাতন্ত্রের নাগরিককুলের অধিকার-চেতনাকে দুমড়ে-মুচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে 'ডোল'-এর উপর চির-নির্ভর করিয়ে সত্য-মিথ্যা, নীতি-দুর্নীতির ফারাককে ভুলিয়ে দিয়ে, বা ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে এক ধর্মের মানুষজনকে অন্য ধর্মের মানুষের বিরুদ্ধে যে লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা মুসোলিনির সর্বগ্রাসী মতাদর্শের টোটালিটারিয়ানিজম বা হিটলারের ইহুদি-নিধনের নাৎসিবাদ থেকে কি খুব দূরে!

আর দুটি প্রসঙ্গ—ছাত্রবৃত্তি ও মিড-ডে মিল। নানা কিসিমের ছাত্রবৃত্তি, মোবাইল-ট্যাব ইত্যাদি গরিব ছেলে-মেয়েদের স্কুলে টেনে আনছে ঠিকই, মিড-ডে মিল চার-পাঁচ বাড়িতে ঠিকে গৃহস্থালির কাজ করা লক্ষ্মীর ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের মুখ দেখছে ঠিকই। কিন্তু কোনো কিছু বাছ-বিচার না করে সব ছাত্রছাত্রীদের জন্য এসব ব্যবস্থা করা কি খুবই দরকার পড়ে?

লক্ষ্যের থেকে উপলক্ষ্য বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি! কোঁয়ারপুর স্কুলের ভাগ্য ভালো, মূল স্কুল-বিল্ডিং-এর পিছনে পশ্চিম অংশে এত সুন্দর ব্যবস্থা আছে রান্না-খাওয়ার। অন্য বিদ্যালয়গুলিতে এই সুযোগ কোথায়! অ-শিক্ষক অ-ছাত্রের এত বেশি গতায়াত শিক্ষা-সাধনার পরিবেশ বজায় রাখতে পারছে কি? তার উপরে রাজনীতির লোকেদের দাপাদাপি তো রয়েইছে।

না, আমি এসব কিছুর বিরোধিতা করছি না। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা না করে সব কিছুই শিক্ষাগুরুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া, তার উপর নানা অছিলায় নিয়োগ-প্রক্রিয়া প্রায় স্তব্ধ করে দিয়ে কী বার্তা দিচ্ছি আমারা! আর এই উপলক্ষ্যগুলোই যদি সবার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতো তাহলে কেওটসা উত্তর পাড়ার ছেলেমেয়েরাও মাথরুনের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যাচ্ছে কেন এত খরচ করে?

□

এবার আসি অশোকদার কথায়, অশোকদা-দের উদ্বেগের কথায়। অশোকদা কোঁয়ারপুরেরই বাসিন্দা, সেই ছোটবেলা থেকেই দাদাকে চিনি। উনাদের বাড়ির সামনে দিয়েই আমাদের স্কুলের যাতায়াত পথ ছিল। দাদা এই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্টও ছিলেন বেশ কিছু দিন। শ্রীযুক্ত দিলীপ রায়ের মতো স্কুলের উন্নয়নে ওনার যথেষ্ট ভূমিকা আছে। দিব্যেন্দুর এই আমলে বাইরঙ্গের বৃদ্ধি অনেকটাই হয়েছে—সে কথা স্বীকার করতেই হবে। বন্ধু বলে বলছি না, ঝাঁ- চকচকে স্কুল বিল্ডিং আমাকেও মুগ্ধ করেছে।

বলতে ভুলে গেছি, দিব্যেন্দুর টু-হুইলারে চেপে ফেরার সময় মালিয়ারার কাছে অশোকদার সঙ্গে দেখা, যার উদ্বেগের কথা এই লেখায় আমার মূল প্রতিপাদ্য। মিনিট পাঁচেকের কুশল-বিনিময়। তার মধ্যেই জানালেন, পথশ্রী প্রকল্পের এই রাস্তাটি তিনি লেগে থেকে অনেক আবেদন-নিবেদন করে স্যাংসেনড করিয়েছেন। এ পর্যন্ত মালিয়ারার কেওট-পাড়া থেকে কোঁয়ারপুর পর্যন্ত ঢালাই-এর এই রাস্তাটির কাজ চলছে। (এর মধ্যে কাজ

শেষ হয়ে গেছে।) কোঁয়ারপুর স্কুলের সঙ্গে কেওটসা, মালিয়ারা, চাকুলিয়া, সাঁড়ি, বরমপুর, খেড়ুয়ার ছেলেমেয়েরা সাইকেল চেপে স্কুলে আসতে পারে, যাতে বিদ্যাচর্চার এই মন্দিরটিকে সচল রাখা যায়—এই দায়বদ্ধতা থেকেই এই ঢালাই-রাস্তার ব্যবস্থা। অশোকদার শিক্ষানুরাগ, এ অঞ্চলের কোমলমতি প্রান্তিক কৃষক পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য তাঁর সদর্থক চিন্তা ও একই সঙ্গে বর্তমান শিক্ষা-জগতে ঘনায়মান উদ্বেগ আমাকেও অভিভূত করেছে। সত্যিই বহু বড় মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষায় এই রকম এক একটা স্কুল তৈরি হয়। তাকে সার্থক করা ও চলমান রাখাও কম কথা নয়। করোনা এবং তারপর শিক্ষা-জগতে এই সীমাহীন নীতিহীনতা অশোকদাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে বাধ্য। যে বাংলা ক্ষুহোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে—"ছিল তার ছেলেমেয়েরা পাটনা স্টেশনে রাত কাটাচ্ছে পরের দিন ওখানে SSC পরীক্ষায় বসার জন্য! বিহারের নামে এই সেদিনও কত উল্লাসিক ছিলাম এই আমরাই! আর আমাদের বেকার ছেলেমেয়েরা ওদের দিকে আজ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে গয়ার আশেপাশের কোনও স্কুলে যদি একটা গতি হয়!

অশোকদার উদ্বেগে আমিও শরিক—যেমন করে হোক স্কুলটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু দেখবেন দাদা, আপনার পথশ্রীর ঢালাই রাস্তা দিয়ে 'দোআঁশলা', (অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরীর ভাষায়, 'নিরেশ') ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলির দাপাদাপি শুরু হয়ে না যায়। ঢালাই রাস্তা পেয়ে পুলকার গিয়ে আপনার নাতি-নাতনিদের ইংলিশ মিডিয়ামের কারখানায় তুলে নিয়ে না চলে যায়! পথশ্রী যেন অজয়-তীরের বাঙালিকে পথভ্রষ্ট না করে।

নিয়ম ভেঙে শেষে উৎপত্তি-কালের কথা, কেন স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি তার ইতিকথা। যদিও আমাদের এই বিদ্যালয়টি সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২ জানুয়ারি, ওই গ্রামের গাবতলায় আর বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই প্রাইমারি স্তরের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট্রিকের পড়াশোনাও চলতো। একমাত্র কবি কুমুদরঞ্জনের স্মৃতিধন্য মাথরুন স্কুল ছাড়া প্রায় ১৫/২০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সে সময় কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার আগে জ্ঞানদাসের কান্দরা স্কুল থেকে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হতো। আশপাশের গ্রামের বয়স্ক লোকের সঙ্গে আলাপকালে এখনো উঠে আসে 'আমি কোঁয়ারপুর স্কুলের ছাত্র ছিলাম!' গ্রামের মহানুভব ব্যক্তিদের নিঃস্বার্থ সাহায্য ও আন্তরিকতায় গড়ে ওঠার এই কাহিনি আমি আমার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরম হিতাকাঙ্খী শিক্ষক মিহিরবাবু (আমরা স্যারকে 'বড় মাস্টার' বলে থাকি!)-র কাছে শোনা। দিব্যেন্দুরা আমাকে শুনিয়েছে, তবে তার অনেকটাই আমাদের এই বড় মাস্টারের কাছ থেকে শুনেই।

এরকম একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে সেই সব মহানুভব উদ্যোগী মানুষজনের কাছে আমরা ছোট হয়ে যাবো। বিশেষ করে শ্রীযুক্ত জীতেন হাজরা ও শ্রদ্ধেয় অনাদিনাথ ভট্টাচার্য পরিবারের স্বেচ্ছায় জমিদান, নারেঙ্গার ডাক্তার অভয়বাবুর অর্থানুকূল্য, চট্টরাজদের মুরারিমোহন বাবুর আন্তরিক উদদ্যোগের কথা মনে রেখে, তাঁদের মহানুভবতা ও ত্যাগকে স্মরণে রেখেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করাতে হবে। তাই এই প্রজন্মের অশোকদার সাথে আমরাও চিন্তান্বিত।

এক্ষেত্রে আমার দুটি কথা—ইংরেজি ও বাংলা দুটি ভাষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তোতাপাখির মতো ইংরেজি শেখানোর স্কুল-ব্যবসা বন্ধ হবে না। আর যাঁরা ভাবেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে না পড়লে আমার ছেলে বা মেয়ের ভবিষ্যতে কিছুই করতে পারবে না, তাঁদের জন্য বলি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাংলা মিডিয়ামে পড়ে আমাদের পরিচিত এক গবেষক-ছাত্র এই সেপ্টেম্বরে লণ্ডন যাচ্ছে কিংস কলেজে কনফারেন্সে পেপার প্রেজেন্ট করতে, আর ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে তিন সপ্তাহ পড়াশোনা করতে! তবে প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের ঔদাসীন্যকেও আমাদের মোকাবিলা করতে হবে। সাইকেল-ট্যাবের নকল সোনা হাতে পেয়ে আসল শিক্ষা-সোনার চাহিদা যেন ভুলে না যায় এই প্রজন্ম! আমাদের অবিভাবকদের সদা সতর্ক থাকতে হবে এ ব্যাপারে।

বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন বর্ধমানের সাঁতারু প্রত্যয় ভট্টাচার্য

বিদ্যুৎ ভৌমিক : বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৮১ কিমি জলপথ সাঁতার কেটে প্রথম স্থান অধিকার করে চ্যাম্পিয়নের খেতাব লাভ করে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন বর্ধমানের প্রত্যয় ভট্টাচার্য। এই ৮১ কিমি জলপথ অতিক্রম করতে প্রত্যয় সময় নিয়েছেন ১০ ঘন্টা ৫৫ মিনিট। গত বছরের এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রত্যয়ই চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম হয়েছিলেন। বিশ্বের সেরা সাঁতারু প্রত্যয় বর্ধমানের চিলড্রেন কালচারাল সেন্টারের সাঁতারু। ঐতিহ্যবাহী মুর্শিদাবাদ সাঁতার সংস্থার সুচারু ব্যবস্থাপনায় এবারের সাঁতার কম্পিটিশন ৭৮ বৎসরে পদার্পণ করলো। গত ১ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুরের আহিরনে ভোর ৫ টায় এই ৮১ কিমি জলপথ অতিক্রম করার প্রতিযোগিতায় ৯ জন সাঁতারু জলে নেমেছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান দখল করেন বহরমপুর সুইমিং ক্লাবের সাঁতারু তাপু সরকার ও তৃতীয় স্থানাধিকারী হলেন মহারাষ্ট্রের পার্থ সন্দীপ হাতাঙ্কর। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে চ্যাম্পিয়ন ছাড়াও সফল সাঁতারুদের হাতে আর্থিক পুরস্কার, ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ চলছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে, দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রীর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করে ৩ সেপ্টেম্বর সিপিআই(এম) গলসী-২ এরিয়া কমিটির ডাকে কুলগড়িয়া বাজারে মিছিল ও পথসভা হয়। বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) নেতা সাইদুল হক, মণিমালা দাস, নন্দকিশোর সাউ। সভাপতিত্ব করেন নাড়ুগোপাল যশ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক কাজী জাফর আলি ও অন্যান্য সদস্য, সদস্যারা।

আর জি কর হাসপাতালের ধর্ষণ ও হত্যায় জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে পথে নামলেন পূর্বস্থলীর মানুষ। এই মিছিলে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল নজরকাড়া। সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটির পাটুলি শাখার উদ্যোগে এই প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয় দামপাল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে পাটুলি পঞ্চায়েতে শেষ হয়। গলসীতে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সিপিআই(এম) গলসী-২ এরিয়া কমিটির আহ্বানে একটি প্রতিবাদ সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি মোস্তাক হোসেন, অমিতাভ মণ্ডল, শিশির কেশ এবং গণ-আন্দোলনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন।

গলসী-২ ব্লকের উড়া গ্রামে তিলোত্তমার বিচার চেয়ে নাগরিক সমাজ থেকে এক মিছিল গোটা গ্রাম ঘুরে উড়া চটিতে এক সংক্ষিপ্ত সভা করে। বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ দাস।

দোষীদের গ্রেপ্তার ও ন্যায় বিচারের দাবিতে মোমবাতি মিছিল বামুনপাড়া মোড় থেকে শুরু হয়ে মেমারি নিউমার্কেট, স্টেশনবাজার, কৃষ্ণবাজার হয়ে মানববন্ধনের মাধ্যমে মোমবাতি মিছিল শেষ হয়। আর জি করে নৃশংস ভাবে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন এলাকার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও অগণিত মহিলা।

গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে স্মরণ

—প্রথম পাতার পর

নেওয়া হয়। ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে আরজিকর হাসপাতালের ডাক্তারকে ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে এদিন রাতে বাড়ির আলো নিভিয়ে মানুষ মোমবাতি জ্বালিয়ে পথে নামেন। কালনা শহরের ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী মূর্তির পাদদেশে জমায়েতের পর মানববন্ধন কর্মসূচি সংগঠিত হয়। এই কর্মসূচির মাঝে প্রতিবাদী গান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে মাল্যদান ও স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে প্রয়াত ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

পাখি-চোখ-৯৪

রত্না রশীদ

পুজো। প্রথম যে শব্দগোছা চলে এলো—আমাদের কোনো পুজো নেই, কাল অশৌচ বছর বছর। বছর বছর। প্রতিটি বছর। অভয়া-নির্ভয়া-ত্রিনেত্রী-সভয়া—যা-ই নাম দিই না কেন, 'ভয়' শব্দটি অজর অক্ষয় হয়ে নেত্য করে যায় দেখি বছর বছর। আমাদের মিথ-এ এমনই আমাদের 'দেবী প্রতিমা' কল্পনা যে অসুর বধ করতে তার নিজস্ব অস্ত্রই নেই, এক চেহারায় অবিশ্বাস্য গ্ল্যামার ছাড়া। অন্যের অস্ত্র দিয়ে নিজের সুরক্ষা কীভাবে হয় জানা নেই, উল্টে অসুর বধের নাটকে ওই অসুরটাই অজেয় অমর হয়ে গেল পরের বছর আবারও সপরিবার দুর্গার সঙ্গে পুজো পেয়ে উদয় হবেন। এই হলো গে কিস্সা। ওই বিনাশ বিনাশ নাটক স্পষ্ট করে দেয়, ওপর ওপর যুদ্ধ দেখালেও অসুর পরিবারের ছাতার মধ্যেই থাকবে উৎসবে একসঙ্গে আসবে, নতুন পোশাক পরিধান-গয়না-সজ্জা-বাহারী অন্তর সবই পাবে। টানা চার পাঁচদিন ধরে স্পেশাল মহাভোগ, ধূপ ধুনো ফুল মালা আরতি—সব সমান সমান মাপে, বরণ করে বিসর্জনের সময় ওকেও বলা হবে—আবার এসো পরের বছর। এটাও তো পুজোরই নিয়ম।

এমনকি স্বর্গরাজ্যেও অসুর ছিল অবধ্য। অসুর একটা নাকি শ'য়ে শ'য়ে। তবু তাদেরও তো বর পাবার জন্মগত অধিকার আছে। অনেক মাথা খাটিয়ে প্রচুর সাধনা বলে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর চাইলো—আমাকে অমর করে দাও।

—আমার ক্ষ্যামতা নেই রে, অন্য বর চা।

অসুর বুদ্ধি বলে কথা। ভেবে-চিন্তে বললো—তবে ঠাকুর এই বর দাও আমাকে যেন কোন পুরুষ/বীর/যোদ্ধা না দিনে, না রাত্রে, কোনো ভাবে বধ করতে না পারে।

বিচক্ষণ ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলে ওকে মৃত্যু বর দান করে বিদায় হলেন।

তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধি এমনই হয়। আরেকজন, সহজে শত্রু নিধন করে সেরা বীর হবার অভিপ্রায়ে শিবকে সাধনায় তুষ্ট করে সামনে এনে ফেললো। কাঁচুমাচু শিব দর্শন দিয়ে বললেন—কিরে, আমি ছাইভস্ম মেখে শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়াই। অযথা আমাকে টানলি কেন?

—প্রভু, আমার আপনার ওই ভস্মটিই চাই যে।

শিব কান চুলকোতে চুলকোতে বিব্রত হয়ে বললেন—খুলে বল বাপু। আমি অতো ঘোর প্যাঁচ বুঝতে পারি না।

—আমাকে এই বর দাও প্রভু, আমি যাকে ছোঁব ছোঁয়া মাত্র সে ভস্ম হয়ে যায়।

—তথাস্তু। বলে শিব চলে যাবার জন্য পিছু ফিরেছে অমনি পেছন থেকে আবারও ডাক—ও প্রভু, টুকুন দাঁড়িয়ে যাও না।

—আবার কি হলো? যা চাইলি তাই-ই তো দিলাম।

—তা তুমি সত্যি বললে না মিথ্যে বললে কি করে বুঝবো। তোমাকে আগে একটু ছুঁয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিই। ব্রহ্মাণ্ডময় হৈ চৈ পড়ে গেল। সৃষ্টি এবার সত্যি লয় পাবে। যে আক্কেলে শিব যে যা চায় তাকে তাই দিয়ে কতোবার যে সৃষ্টিকে বিপদের মধ্যে ফেলেছে, তার ইয়ত্তা নেই। ওদিকে শিবও সর্বনাশ টের পেয়ে প্রাণভয়ে দে ছুট—দে ছুট। শিবও ছুটছে—অসুরও ছুটছে। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে—গেল-গেল রব উঠেছে দশদিকে। এমনি সময় ওপর মহলের নির্দেশে নারদ এসে দাঁড়ালো অসুরের পথ জুড়ে— এতো দৌড়ে দৌড়ে প্রাণান্ত হচ্ছো কেন?

—দেখো না ঠাকুর শিব বর দিয়েছে আর তার সত্যতা পরীক্ষা করতে দিচ্ছে না। এরপর পুরো ঘটনা বলে চললো অসুর। শোনার সঙ্গে সঙ্গে চতুর ঢেঁকিবাহন যেন তাচ্ছিল্যের সুরে উপায় বাতলালো—আরে নিজেকে ছুঁয়েই তো সবার আগে পরীক্ষা করা সহজ—এ্যাতো দৌড়াদৌড়ির তো প্রয়োজন নেই।

আমাদের অভয়ার পিছু পিছুও ভিড়ে গেছে কিছু ধ্বংসাত্মক অশুভ নেক্সাস। এই জঙ্গল ভেদ করে করেই চলবে আমাদের পুজোর আয়োজন।

(চলবে)

আস্থা অর্জন করছে

—প্রথম পাতার পর

দিয়ে হাসপাতালের ঘাটতি পূরণ করছেন ডাক্তার বাবুরা। ৯ সেপ্টেম্বর বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে স্থায়ীভাবে চলবে অভয়া ক্লিনিক। ৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কার্জন গেটে অভয়ার নাটক পরিবেশন করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। কার্জন গেটের দুপাশে পথ চলতি মানুষ নাটকটি দেখে শাস্তির দাবিতে আরও উৎসাহিত হন।

অন্যদিকে নারী ঐক্যমঞ্চের পক্ষ থেকে গত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে এক বিশাল মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। সাধারণ মানুষ এটিতে যোগদান করে তিলোত্তমার বিচার যাতে দ্রুত হয় এবং সঠিক পদ্ধতিতে হয় সে দাবিতে সরকারি কর্মচারীরা এবং পেনশনার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আরজিকর ঘটনার প্রতিবাদে দুটি বিরাট মিছিলের আয়োজন করা হয়। আরজিকর মামলার শুনানির জন্য ৮ সেপ্টেম্বর সারারাত এক বিশাল কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জুড়েই অভয়ার জন্য ন্যায় বিচারের দাবিতে পথে নেমেছেন মানুষ। ৯ সেপ্টেম্বর মামলার শুনানির জন্যই এই রাত দখল। ব্যাংক কর্মচারী, সরকারি কর্মচারীরা ও ন্যায় বিচারের দাবিতে সোচ্চার হোন।

দুর্নীতির র‍্যাকেট উন্মোচিত

—প্রথম পাতার পর

নথি নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও পুলিশকে জানালেও এত দিন কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। সব কুকীর্তি ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে আদালতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন চিকিৎসক'রা। ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী অভিযোগ করেছেন, আর জি কর-এর নির্যাতিতা যাতে বিচার না পায় তার জন্য এই চক্র রাতভর সক্রিয় ছিল ঘটনার দিন। এই দুষ্কৃতীদের বদলি করে কেস ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চলছে। হাসপাতালের চিকিৎসক গৌরাঙ্গ প্রামাণিক জানান অভীক ঘনিষ্ঠ পাঁচ জন কিভাবে এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারে গ্র্যান্ড অনার্স পেয়ে গেল তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছি। এরাই অভীকের হয়ে থ্রেট কালচার, নম্বর বাড়ানো, হোস্টেল পাইয়ে দেওয়া, তোলাবাজি সবই চালাতো। তারই পুরস্কার স্বরূপ এই প্রাপ্তি।

অন্যদিকে ২০১৩ সালে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগ থেকে মৃতদেহ পাচারের অভিযোগেও এই চক্রের নাম জড়িয়েছে। পুলিশের কাছে এই লাস পাচারের সাথে জড়িত থাকার জন্য একাধিক প্রভাবশালীর নাম সামনে আসে। শাসকদলের প্রভাবশালীদের নাম ধৃতরা কবুল করায় পুলিশ এই ঘটনা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছে! শুধু তাই নয় পুলিশের কাছেও সূত্র মারফত বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয় ধৃতদের নিয়ে পুলিশ যেন গভীর জলতে না যায়। ফলে জামিন অযোগ্য একাধিক ধারা থাকা সত্তেও দুষ্কৃতীরা জামিনও পেয়ে যায়। হাতে নাতে লাশ সহ গ্রেপ্তার হবার পর কিভাবে জামিন হলো তা নিয়ে বিস্ময় তৈরি হয়েছে। শাসকদল ও পুলিশের বোঝাপড়াতেই এই কেস ধামাচাপা পড়েছে এমনই অভিযোগ করছেন বর্ধমানের মানুষ।

ধৃতরা পুলিশের কাছে যে প্রভাবশালীদের নাম বলেছিল তাদের পুলিশ কেন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি? এখানকার একাধিক রক্ষীরা অভিযোগ করেছেন, মরদেহ বহনকারী গাড়িগুলি এমন ভাবে তৈরি উপরে একটি মরদেহ শোয়ানো থাকলেও নিচের গোপন চেম্বারে আরো দুটি মরদেহ লুকিয়ে পাচার করা হতো। এই ভাবেই দিনের পর দিন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ অ্যানাটমি বিভাগ থেকে লাশ পাচার হয়ে এসেছে। এক একটি লাশের দাম ৩ লক্ষ টাকা।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায় ***-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি***

নাম/পদবী পরিবর্তন

☐ আমি সচীন ভাণ্ডারী পিতা—তেজনারায়ণ ভাণ্ডারী বর্তমান ঠিকানা বাগিলা, মেমারি জেলা [illegible]। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ২ [illegible] এক এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম সচীন ভাণ্ডারী, পিতা তেজনারায়ণ ভাণ্ডারী যা আমার আধার কার্ডে নথিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB41–19990025022-তে আমার নাম ভুলবশতঃ সচীন ঠাকুর, পিতা টি. এন ঠাকুর নথিভুক্ত হয়েছে। সচীন ভাণ্ডারী পিতা তেজ নারায়ণ ভাণ্ডারী ও সচীন ঠাকুর পিতা টি এন ঠাকুর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

Editor : Jyotirmay Bhattacharya, Printed & Published by Dinesh Jha on behalf of Natun Chithi Trust from 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Printed at Natun Chithi Press with assistance of Sadhana Press 11 J B Mitra Road Burdwan-713104, Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com Price : Rs. 2/-